নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project.

Sweden
Sverige

marico
make a difference

UNDP

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project.

Sweden
Sverige

marico

UNDP

"স্বপ্ন প্রকল্পে" কর্মরত মাঠপর্যায়ের কর্মী, ইউনিয়ন পরিষদ এর ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং মহিলা উপকারভোগীদের জন্য প্রণীত-

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রণয়নে

সেলিনা চৌধুরী, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট - জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, স্বপ্ন প্রকল্প

সম্পাদনায়

কাজল চ্যাটার্জী, জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক, স্বপ্ন প্রকল্প

বানান সংশোধন ও পরিমার্জন

কাশফিয়া শারমিন, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট - রিসার্চ এন্ড কমিউনিকেশন, স্বপ্ন প্রকল্প

মেয়াদকাল: ১ দিন

প্রস্তুতকরণ

মে - জুন ২০২২

স্বপ্ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ইউএনডিপি, এজেন্সী অব সুইডেন ও মারিকো বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	৫
২	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
	(উদ্দেশ্য, সময়কাল, কারা কখন ব্যবহার করবেন বিষয় সমূহ আলোচনা চলাকালে লক্ষণীয় বিষয় সমূহ)	৬
৩	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর রুপরেখা/প্রশিক্ষণসূচী	৭
৪	জেন্ডার বিষয়ক ধারণা (জেন্ডার শব্দকোষ) সমূহ, সেক্স ও জেন্ডার এর পার্থক্য	৮
৫	জেন্ডার বৈষম্য, সমতা ও সাম্যতা এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থান	৯-১০
৬	জেন্ডার মূলধারাকরণ এবং জেন্ডার সচেতনতা	১১
৭	নারীর প্রতি সহিংসতা/ নির্যাতন	১২-১৪
৮	করোনা মহামারীতে নারীর প্রতি সহিংসতার সংক্ষিপ্ত চিত্র	১৫
৯	নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক সমূহ এবং নারীর অধিকার	১৬-১৭
১০	নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী পদক্ষেপ সমূহ	১৮-১৯
১১	বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য আইন এবং অনুচ্ছেদ সমূহ	২০-২১
১২	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিকারে করণীয় ও সহযোগিতা	২২-২৩
১৩	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের সেবাসমূহ	২৪
১৪	সহিংসতা প্রতিকারে বা সাহায্যে হট লাইন সমূহ	২৫
১৫	সহিংসতা বা নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক ফর্ম	২৬
১৬	কেস ষ্টাডি	২৭-২৮
১৭	সহায়ক গ্রন্থ সমূহ	২৯
১৮	সংযুক্তি সমূহ	৩১

১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০

৩. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মে -২০১৩

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

ভূমিকা

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশের সাময়িক খাদ্য ঘাটতি প্রবণ, দারিদ্র্য পীড়িত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা জামালপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৭১টি ইউনিয়নের প্রায় ৬০০০ হত দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার, ইউএনডিপি, এম্বেসী অব সুইডেন এবং মারিকো বাংলাদেশ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগগুলো গ্রামীণ হত-দরিদ্র নারী ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে আকস্মিক বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা প্রদান ।

নারী উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি স্বপ্ন প্রকল্প অন্যান্য কর্মসূচীর সাথে জেন্ডার (লিঙ্গ) সমতা ও সামাজিক উন্নয়ন একটি crosscutting ইস্যু হিসাবে মূলধারাকরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্প এলাকায় লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা বিশেষ করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল টেকসই জীবনমান (Sustainable Livelihoods Development) নিশ্চিতকরণ ও সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

স্বপ্ন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীবৃন্দের জেন্ডার সমতা ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা, প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মনে করছে। স্বপ্নকর্মীরা সফল ও কার্যকরভাবে জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়গুলো নিজেরা আত্মস্থ করতে পারে; পাশাপাশি স্বপ্নের উপকারভোগী নারী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দের কাছে দক্ষভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, বিষয়ের আবশ্যকতা এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে ১ (পূর্ণদিবস) দিনের এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণীত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সূচনা করা হয়েছে।

এ মডিউলটি একজন প্রশিক্ষক বা সহায়তাকারীর জন্য একটি গাইডলাইন মাত্র। বিষয়ের আবশ্যকতা এবং অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করা যেতে পারে।

আশা করা যায় এ মডিউলটি অনুসরণে প্রশিক্ষণ প্রদান বা আলোচনা কালে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সমাজে জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

যে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ইউএনডিপি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রতিনিধি তাদের সুচিন্তিত মতামত এবং রেফারেন্স বই দিয়ে মডিউলটি তৈরী করণে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

- নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয় সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রকল্প এলাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষণ সময়কাল: ১ দিন (পূর্ণদিবস)

প্রশিক্ষক: স্বপ্ন প্রকল্পের জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট/ ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এবং জেলা ব্যবস্থাপকবৃন্দ

প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারী: স্বপ্ন প্রকল্পে কর্মরত সহযোগী সংস্থার কর্মীবৃন্দ (ইউনিয়ন কর্মী, প্রজেক্ট অফিসার এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী)।

কারা ও কখন ব্যবহার করবেন:

- প্রশিক্ষণ মডিউলটির ব্যবহারকারী হচ্ছেন স্বপ্ন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ।
- মাঠপর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক সভায় মডিউলের আলোচ্য বিষয়গুলোর এক একটি বিষয় সভার আলোচনা সূচীতে অর্ন্তভূক্ত করে আলোচনা করবেন।
- মাঠপর্যায়ের কর্মীবৃন্দ তাদের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বপ্ন উপকারভোগীদের সাথে উঠান বৈঠক অথবা দলীয় সভায় আলোচনা করবেন।

আলোচনা চলাকালে লক্ষণীয় বিষয় সমূহ

- প্রথমেই মডিউলটির সূচীপত্র দেখে নিন।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জেন্ডার উন্নয়ন বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে।
- মডিউলে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা জানার জন্য পুরো মডিউলটি একবার পড়ে নিন।
- আলোচনায় সকলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। একতরফাভাবে আলোচনা করবেন না; এতে করে অংশগ্রহণকারীগণ শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন।
- মডিউলের প্রতিটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়ুন; তাতে করে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও বিষয়সম্পর্কিত তথ্য পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।
- যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পড়ে আত্মস্থ করবেন।
- উপস্থাপনার পূর্বে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে ও অধিবেশনটি প্রাণবন্ত হবে তা ঠিক করে নিন।
- অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতাকে সম্মান করুন। অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের আহবান জানান। প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করবেন ।
- স্বপ্ন উপকারভোগীর সাথে উঠান বৈঠক বা দলীয় আলোচনা ও ইউনিয়ন পরিষদ এর ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা কালে আলোচনার সময়ের উপর ভিত্তি করে এক একটি বিষয় নির্ধারণ করবেন।
- আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ এর জন্য ধন্যবাদ জানান।

> স্বপ্ন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক সভায় এবং স্বপ্ন উপকারভোগীদের সাথে উঠান বৈঠক বা দলীয় সভায় আলোচনা করবেন বিধায় এখানে বিষয় ভিত্তিক কোন পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) সংযুক্ত করা হয়নি।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর রুপরেখা/প্রশিক্ষণসূচী

সময়	মূলবিষয়	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	উপকরণ
৯.০০-৯.৩০	পরিচিতি	▪ স্বাগত বক্তব্য এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচিত হওয়া ▪ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য আলোচনা ▪ প্রশিক্ষণের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সমূহ আলোচনা	আলোচনা কার্ড গেম	ছবির কার্ড
৯.৩০-১০.৩০	১.জেন্ডার (লিঙ্গ) বিষয়ক ধারণা	জেন্ডার বিষয়ক শব্দকোষ সমূহ ১.১: সেক্স ও জেন্ডার এবং এর পার্থক্য ১.২: জেন্ডার বৈষম্য, সমতা, সাম্যতা ১.৩: নারীর অবস্থা ও অবস্থান ১.৪ জেন্ডার মূলধারাকরণ ও সচেতনতা,	আলোচনা, দলীয় আলোচনা কার্ড গেম ছবি প্রদর্শন	ছবি / ফ্লিপচার্ট বোর্ড ও পেপার মার্কার এবং ভিপকার্ড
১০.৩০-১১.০০	নাস্তার বিরতি			
১১.০০-১:০০	২. নারীর প্রতি সহিংসতা	২.১ লিঙ্গ (জেন্ডার) ভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন ২.২: সহিংসতা (Violence) বা নির্যাতনের কারণ ও ধরন ২.৩: করোনাকালীন নারীর প্রতি সহিংসতার কিছু চিত্র ২.৪: নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী পদক্ষেপ সমূহ ২.৫: নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বা সুরক্ষায় করণীয় ।	বক্তৃতা, অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা, ছবি প্রদর্শন, কেস স্টাডি, ভিডিও শো	ফ্লিপচার্ট বোর্ড, পেপার ও মার্কার
১.০০ - ২:০০	দুপুরের খাবার এবং নামাজের বিরতি			
২:০০- ৩: ০০	৩. ক্ষমতায়ন ও অধিকার	৩.১ নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার ৩.২ নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশকসমূহ ৩.৩ বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য আইন এবং অনুচ্ছেদ সমূহ	আলোচনা, অংশগ্রহণমূলক, ছবি প্রদর্শন। ভিডিও শো	ছবি, ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, পেপার ও মার্কার,
৩:০০-৩:৩০	চা বিরতি			
৩:৩০-৪:৩০	৪. নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিকারে করণীয় ও সহযোগিতা	৪.১ গ্রাম আদালত (Village Court) ৪.২ নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুদের সহায়তার জন্য সরকারী মাল্টি-সেক্টরাল সেবাসমূহ ৪.৩. সহিংসতা প্রতিকারে ও সহায়তায় হট লাইন (Hotline) সমূহ ৪.৪. স্বপু উপকারভোগীদের সহিংসতা/ নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক ফর্ম আলোচনা ৪.৫ সারাদিনের আলোচনার শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর কেস ষ্টাডি প্রদর্শন ৪.৬ সারাদিনের প্রশিক্ষণ বিষয়ের উপর পর্যালোচনা এবং সমাপ্তি	আলোচনা, অংশগ্রহণ মূলক, ছবি প্রদর্শন। ভিডিও শো	ছবি, ফ্লিপচার্ট বোর্ড ও পেপার এবং মার্কার,

প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়সমূহের বর্ণনা

১. জেন্ডার (লিংগ) বিষয়ক ধারণা

উদ্দেশ্য :

- সেক্স ও জেন্ডার এবং এর পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- জেন্ডার বৈষম্য, সমতা, সাম্যতা সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন;
- জেন্ডার মূলধারাকরণ এর প্রক্রিয়া সমূহ ও সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়: ১ ঘন্টা পদ্ধতি: আলোচনা, দলীয় আলোচনা, কার্ড গেইম

১.১ সেক্স (লিঙ্গ) ও জেন্ডার শব্দকোষ সমূহ

সেক্স: সেক্স হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈশিষ্টসূচক ভিন্নতা যা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে।

এটি শারীরিক গঠনে নির্ধারিত নারী - পুরুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট এবং প্রায় অপরিবর্তনীয়।

সেক্স

জেন্ডার: জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমিকা, আচরণ ও মূল্যবোধ নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যা সংস্কৃতি ও সমাজ কর্তৃক আরোপিত। নারী ও পুরুষের সামাজিক লিঙ্গগত পার্থক্য স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। যার ফলে একই সংস্কৃতিতে বা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ব্যাপক ভিন্নতা দেখা যায়। যা স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।

জেন্ডার

সেক্স ও জেন্ডার এর পার্থক্য

সেক্স	জেন্ডার
জৈবিক লিঙ্গ নারী ও পুরুষের জৈবিক বিশেষত্ব।	জেন্ডার সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভভাবে নির্ধারিত
প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত যা ব্যক্তি জন্মগতভাবে লাভ করে।	বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান; যেমন- পরিবার, সরকার, জনগোষ্ঠী, স্কুল, মিডিয়া ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে জেন্ডার ভূমিকা সৃষ্টি করে।
জৈবিক লিঙ্গ স্থান, কাল নির্বিশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	জেন্ডার সামাজিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার ফলে সংস্কৃতি ভেদে ও সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটে।

১.২ জেন্ডার বৈষম্য, সমতা, সাম্যতা

জেন্ডার বৈষম্য (Gender discrimination)

- যখন লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষের প্রতি সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়, তখনই জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সমাজের পুরুষ ও নারীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরাজমান জেন্ডার অসমতাই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তি। পুরুষদের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব এবং নারীদের প্রতি অসম আচরণ এ বৈষম্যের ভিত্তি। গতানুগতিক মূল্যবোধ, সাক্ষরতার নিম্নহার ও নিম্নমানের শিক্ষা, সচেতনতার অভাব, যথাযথ নির্দেশনার অভাব,পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা ইত্যাদি বহুবিধ কারণ এ ধরনের অসম আচরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা (Gender equality and equity)

- সমতা (Gender equality) : জেন্ডার সমতা অথবা নারী ও পুরুষের সমতা বলতে বুঝায়, নারী ও পুরুষের অধিকার, দায়িত্ব কর্তব্য, সুযোগ, আচরন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতা অর্জন। আর এগুলোর প্রতিফলন ঘটবে-চাকুরী, ব্যবসা ও কাজের ক্ষেত্রে। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেন নারী পুরুষ নিজেদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন। জেন্ডার সমতার অর্থ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা ।

- জেন্ডার সাম্যতা (Gender equity)

  জেন্ডার সাম্যতা হচ্ছে নারী ও পুরুষকে ন্যায় ও ন্যায্যতার দৃষ্টিতে দেখার প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা সমতা অর্জন করি। সাম্যতা হল সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি কৌশল

সমতা সাম্যতা/ ন্যায্যতা

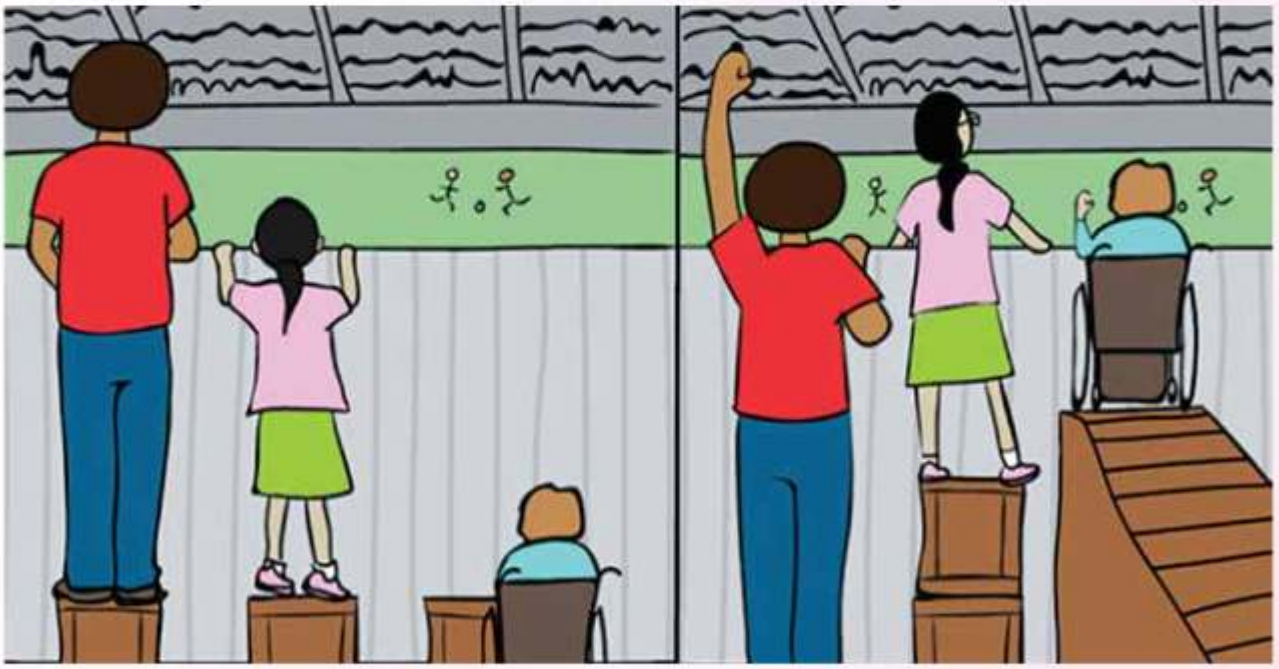

১.৩ নারীর অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা

ইংরেজী (Condition) শব্দের বাংলা অর্থ হলো **"অবস্থা"**। মূলত ব্যক্তির বস্তুগত পরিস্থিতি বোঝাতে "অবস্থা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, জীবনমানের ভালো মন্দ ইত্যাদি নির্দেশের জন্যও "অবস্থা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরিবারে ও সমাজে নারী পুরুষের জীবনযাত্রার সাথে যে সব উপাদান যুক্ত তা তুলে ধরা হয় "অবস্থা" শব্দটির মাধ্যমে। অবস্থা নির্ণয় করতে গিয়ে সে সকল বস্তুগত উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, আয়-উপার্জন ইত্যাদি যা জীবন যাত্রার মানের সাথে জড়িত।

অবস্থান:

ইংরেজী (Position) শব্দের বাংলা অর্থ হলো **"অবস্থান"**। ব্যক্তির মর্যাদা, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ বোঝাতে (status) "অবস্থান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মর্যাদার সাথে সম্পদের ওপর ব্যক্তির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ক্ষমতা, মতামত প্রদানে সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পছন্দ - অপছন্দ করতে পারা, সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যক্তির মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। পরিবারে, সমাজে, সংগঠনে ব্যক্তির "অবস্থান" ব্যক্তির মর্যাদা নির্দিষ্ট করে থাকে।

১.৪: জেন্ডার মূলধারাকরণ

উন্নয়ন, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার একটি কৌশল হচ্ছে জেন্ডার মূলধারাকরণ। যেমনঃ উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করা। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমতা রক্ষার উদ্যোগই হচ্ছে জেন্ডার মূলধারাকরণ।

রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সুযোগ ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ও বিশেষ গোষ্ঠীকে সম্পদ ও সুযোগ গ্রহণে সম্পৃক্তকরণ / অন্তর্ভূক্ত করা বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারীদের। জেন্ডার সচেতনতা হল নারী ও পুরুষদের ভূমিকা (role) ও সম্পর্ক (relations) এর মধ্যে যে ভিন্নতা (diversity) ও বৈচিত্রতা (variation) রয়েছে সে সম্পর্কে জানা এবং সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া ।

জেন্ডার মূলধারাকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা Process

জেন্ডার সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

- পারিবারিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা সহজতর হয়;
- কারখানার উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার উন্নয়ন ঘটে;
- সংস্থার মধ্যে ভাল পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়;
- একে অপরের সাথে দক্ষতা ও সম্ভাবনাগুলো ভাগ করে নেয়া যায়;
- বেতনের বৈষম্য (gap) কমাতে সহায়তা করে;
- নির্যাতন ও নিপীড়নের হার কমে;
- একে অপরের মধ্যে সহযোগিতার হার বাড়ে;
- বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়;

২. নারীর প্রতি সহিংসতা/ নির্যাতন

উদ্দেশ্য :

- লিঙ্গ (জেন্ডার) ভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণ ও ধরন সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে পারবেন
- করোনাকালীন নারীর প্রতি সহিংসতার কিছু উপাত্ত সম্পর্কে সচেতন হবেন
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী পদক্ষেপ সমূহ বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বা সুরক্ষায় করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন

সময়: ২ ঘন্টা

পদ্ধতি: বক্তৃতা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, ছবি প্রদর্শন

২.১ সহিংসতা

সহিংসতা

সহিংসতা হল এমন একধরনের আচরণ যা অন্যায়ভাবে অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রন করতে চায়, যার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত বা হত্যা করা। ব্যক্তি তার ইচ্ছা থেকে সহিংসতা করে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে "নিজের বিরুদ্ধে,অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, শারীরিক শক্তি বা শক্তির হুমকি দেয়া বা প্রকৃত উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার, যার ফলে আহত, মৃত্যু, মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্থ বা বঞ্চনার শিকার হওয়া"। জাতিসংঘের ডেকলারেশন অন দ্য ডেকলারেশন অফ ভায়োলেন্স এগেইস্ট উইমেন থেকে বলা হয়েছে, **"সহিংসতা হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে নারীর ও পুরুষের মধ্যকার ঐতিহাসিক অসম ক্ষমতা সম্পর্কের প্রকাশ"** এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হচ্ছে প্রধান সামাজিক কৌশলগুলোর মধ্যে একটি যার দ্বারা নারীদের পুরুষের তুলনায় অধীনস্ত অবস্থানে জোর পূর্বক নিয়ে যাওয়া হয় ।

২.২: লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন

কোনো ব্যক্তি শুধু তার লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের (নারী/পুরুষ/অন্যান্য) কারণে যে সহিংসতার সম্মুখীন হন তাকে সাধারণত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বলা হয়। সহিংসতার শিকার নারী বা পুরুষ উভয়েই হতে পারে। আবার নারী বা পুরুষ বা উভয়ের দ্বারা সহিংসতা ঘটতে পারে। সাধারণত সব শ্রেণীর পুরুষই সহিংসতার শিকার হন না কিন্তু সব শ্রেণীর নারীই সহিংসতার শিকার হন। জাতিসংঘের ঘোষণা ১৯৯৩ অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত এমন আচরণ, যা নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করে।

অন্যভাবে বলা যায়, নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে ঐ সকল বৈষম্যমূলক আচরণ, যা নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপদাপন্ন করে তোলে। যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়ন হচ্ছে নারী-সহিংসতার অন্যতম দিক।

আমরা জানি যে, বিশ্বজুড়ে নারী এবং কন্যা শিশুর প্রতি এই সহিংসতা আজ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে; বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক আবহ ইত্যাদি কারণে আমাদের সমাজে নানা রকমের বৈষম্য দেখা যায়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বৈষম্যের শিকার হন নারী। এই বৈষম্য থেকেই শুরু হয় নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি শারীরিক, মানসিক, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহিংসতা।

২.৩: সহিংসতা/ নির্যাতনের ধরণ

নারীর প্রতি সহিংসতা সাধারণত নিম্নরূপ

- **শারীরিক নির্যাতন:** লাঠি দিয়ে পেটানো, থাপ্পড় মারা, লাথি মারা, চুল ধরে টানা, এসিড মারা, আগুনে পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি।
- **মানসিক নির্যাতন:** গালি দেয়া, হুমকি দেয়া, অন্যের সামনে ছোট করে কথা বলা, অবহেলা বা বৈষম্য ইত্যাদি।
- **যৌন নির্যাতন:** যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, বাজে অঙ্গভঙ্গি করা, বাজে ছবি দেখানো, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়া ইত্যাদি।
- **অর্থনৈতিক নির্যাতন:** সংসার পরিচালনার টাকা না দেয়া, প্রয়োজনে চিকিৎসা না করানো, জোর করে টাকা ছিনিয়ে নেয়া, টাকা দেয়ার জন্য জোর করা ইত্যাদি।
- **পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন :** পরিবারের মধ্যে আপনজনের কথাবার্তা, আচার আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা যদি কেউ শারীরিক ও মানসিক ভাবে কষ্ট পায় তাকেই পরিবারিক নির্যাতন/ সহিংসতা বলে। অর্থাৎ পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক যেমন রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্কীয় কারণে অথবা দত্তক বা যৌথ পরিবারের একজন পুরুষ সদস্য দ্বারা পরিবারের কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায়। তদ্রুপভাবে সমাজের কিছু সংখ্যক দুশ্চরিত্র অর্থলোভী ও ব্যভিচারী ব্যক্তি লোভ লালসার শিকার হয়ে নারী ও শিশুদের উপর নানা রকম শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালায় । এমনকি নানা রকম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া বা বাধা প্রদান করা এমনকি একঘরে করে রাখে।

২.৪ নারীর প্রতি সহিংসতা/নির্যাতনের ধরণের ব্যাখ্যা সমূহ

ধর্ষণ:

ধর্ষণ এক প্রকার যৌন নির্যাতন। নারীর ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক তার সাথে যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়াকেই ধর্ষণ বলে। নারীকে জোর করে অপহরণ করে দল বেঁধে বা একক ভাবে ধর্ষণ করা হয়। এমন কি অনেক সময় ধর্ষণের পর নারীকে হত্যা করা হয়।

এসিড নিক্ষেপ:

এসিড নিক্ষেপ হলো এসিড বা এ জাতীয় পদার্থ নারীর চেহারা বা শরীরে ছুড়ে মারা। এসিড নিক্ষেপের কারণসমূহ হলো - প্রেম এ প্রত্যাখ্যাত হওয়া, যৌতুকের দাবী পূরণ না করা বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজী না হওয়া। এসিড নিক্ষেপের কারণে অনেকের চেহারার বিকৃতি ঘটে,মৃত্যু ঘটে বা অনেক ক্ষেত্রে আজীবনের জন্য শারীরিকভাবে অঙ্গহানী হয়।

নারী হত্যা:

নারী সহিংসতার উল্লেখ্যযোগ্য একটি চিত্রই হলো নারী হত্যা। নারী হত্যা বিভিন্ন পন্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন নারীকে পিটিয়ে, কুপিয়ে ও বিষ খাইয়ে হত্যা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২টি কারণ হলো - যৌতুকের দাবী এবং বহু বিবাহ।

বাল্য বিবাহ:

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহে বাল্য বিবাহ অতি পরিচিত ঘটনা। ইউনিসেফের তথ্যমতে, আমাদের দেশে ৬৪% নারীর বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে। যদিও ১৮২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধন ১৯৮৪) অনুযায়ী ছেলেদের বিবাহের নূন্যতম বয়স ২১ বছর আর মেয়েদের নূন্যতম ১৮ বছর। কিন্তু দরিদ্রতা, অশিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক কারণে বাল্য বিবাহ হয়ে থাকে। বাল্য বিবাহের কারণে মাতৃমৃত্যুর হার ও অনেক বেশী হয়।

গৃহকর্মী নির্যাতন:

আমাদের মনে রাখতে হবে গৃহকর্মীরাও মানুষ। তাদের নির্যাতন করা সহিংসতার নামান্তর। গৃহকর্মীর প্রতি নির্যাতন বা সহিংসতা চালানো একটি ঘৃণ্য ও জঘন্যতম কাজ।

পতিতাবৃত্তি:

কোন নারীই ইচ্ছা করে পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয়না। হায়নারুপি কিছু পুরুষ অর্থের লালসায় বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পতিতালয়ে বিক্রি করে, তাদের কে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করে। সাধারনত: নারীদের দিয়ে এ কাজ জোর পূর্বক করানো হয়। তাই একে নারীর প্রতি সহিংসতা বলা হয়ে থাকে।

যৌতুকের কারণে নির্যাতন:

নারীর প্রতি সহিংসতার একটি অন্যতম কারণ হলো যৌতুকের জন্য নারীকে নির্যাতন ও অত্যাচার করা। স্বামী, শ্বশুর শ্বাশুড়ি সহ স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনেক সময় একযোগে যৌতুকের জন্য নারীকে চাপ প্রয়োগ করে, অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। যা তখন নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যৌতুকের এ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ইভটিজিং:

আধুনিককালে নারীর প্রতি সহিংসতার একটি উল্লেখযোগ্য ধরন হল ইভটিজিং। ইভটিজিং হচ্ছে নারীর প্রতি যৌন হয়রানির একটি প্রকাশ্য বেপরোয়া এবং ভয়াবহ রূপ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিসগামী নারীরা বেশী ইভটিজিং এর শিকার হয়। এর ফলে আত্মহত্যার হার বেড়ে যায়।

কর্মস্থলে নির্যাতন:

কর্মজীবি নারীরা কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হন। কর্মস্থলের কর্মকর্তা নারীকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি করে থাকে। এ ছাড়াও নারীর প্রতি কুদৃষ্টি, অশালীন আচরণ, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীকে উত্যক্ত করে। সহিংসতা থেকে বেঁচে থেকে সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করা নারীদের অধিকার। তাই নিরাপদ ও সহিংসতা মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি - বেসরকারি সকল সংস্থা সমূহের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

নারী-পুরুষের সচেতনতা
বন্ধ করবে সহিংসতা

২.৫ করোনা মহামারীতে নারী সহিংসতার সংক্ষিপ্ত চিত্র (ভবিষ্যৎ মহামারিতে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে)ঃ

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমরা করোনাকালে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে জানতে পারছি। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এক জরিপে প্রকাশ করেছে (এপ্রিল - সেপ্টেম্বর, ২০২০) যে করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে ৩১% এবং শুধু মে মাসেই মোট ১১.৩২৩ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১১.০২৫ জন গৃহস্থালী সহিংসতার শিকার হয়েছে, ২৩৩ জন যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে, ৪৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে বা ধর্ষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৭ জন খুন হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, মে মাসে মোট ৮৬ জন নারী খুন হয়েছেন স্বামীর হাতে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের রিপোর্টে দেখা যায়, বেশীরভাগ নারীই তাদের স্বামী বা স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছে ।

করোনা মহামারীতে নারীর ওপর সব ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতা বেড়েছে। করোনা সংক্রমন শুরুর প্রথম দিকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মানুষের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকায় নির্যাতিত নারীরা চাইলেও কারও সহযোগিতা পাননি। এমন কি নির্যাতিতা নারী যে তার বাবার বাড়ীতে আশ্রয় নেবেন সে সুযোগও ছিল না। আবার করোনাকালীন সামাজিক নিরাপত্তার কারণে নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবিরা চাইলেও ভুক্ত ভোগীকে সহযোগিতা করতে পারেননি। থানাগুলোতেও অনলাইনে মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করতেও সমস্যা হয়েছে।

বিশেষ করে করোনা সংক্রমণ শুরুর প্রথম কয়েকমাস দেশে আদালত বন্ধ থাকায় নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পায়। চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে ৮৮৯ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হন ১৯২জন। ধর্ষণের পর মৃত্যু হয় ৮১ জনের। ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় ১৯২ জনকে আর ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ৯ জন নারী। এই আট মাসে স্বামীর নির্যাতনে মারা যান ১৬৩ জন নারী। যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ৬৬ জন। শারীরিক নির্যাতনের কারণে ৫৫ জন মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়ে এসিড হামলার শিকার হন ১৭জন নারী। তবে শুধু নারীরাই নয়, করোনাকালে কন্যাশিশুদের ওপরও চলে নির্মম অত্যাচার। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের দেওয়া তথ্য মতে জানুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ৩২৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয় আর যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১০৪ জন শিশু।

করোনায় এই সময়েও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে ভুক্তভোগী নারীরা আসছেন। অর্থাৎ অপরাধ কিন্তু কমেনি। সাধারণ সময়েও নারীর ওপর সহিংসতা হয় কিন্তু করোনায় অর্থনৈতিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন একসঙ্গে সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। করোনা মহামারী যেন নারী সহিংসতাকেও মহামারীতে পরিণত করেছে। করোনা মহামারীর সময় পারিবারিক সহিংসতা যেমন ছিল তেমনি নারী পাচারের ঘটনা ও ঘটছে। (২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২০, বাংলাদেশ প্রতিদিন)

৩. ক্ষমতায়ন ও অধিকার

উদ্দেশ্য :

- নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন
- নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য আইন এবং অনুচ্ছেদ সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময়: ১ ঘন্টা পদ্ধতি: আলোচনা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, ছবি প্রদর্শন

৩.১ ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার

ক্ষমতায়ন হল ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনমান অর্জনের একটি উপায়। নারীর ক্ষমতায়ন হল সমাজে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন। ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ও পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার পাওয়া। বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞানুযায়ী " ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি বা দলের দক্ষতা বৃদ্ধি করে" অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে এমন সাবলীলভাবে গড়ে তোলা যেন সে " পারিনা" এই শব্দটাকে গ্রাহ্য না করে "পারি" শব্দটাকে নিজের জীবনে যুক্তিযুক্ত করে তুলতে পারে।

তাই ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী-পুরুষ বস্তুগত, মানবিক,বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এভাবে একজন নারী যখন তার জীবনে মতামত গ্রহণে ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন মনে করা হয় তার ক্ষমতায়ন হয়েছে।

ক্ষমতায়ন বলতে প্রথম যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হল নিজের বোধকে জাগ্রত করা। একজন মানব সন্তান হিসাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজের উপলব্ধিতে জাগ্রত করা। যেমনঃ মানব সন্তান বা মানুষ হিসাবে আমি কোথায়? আমার পারিবারিক, সামাজিক, আইনগত অবস্থান কোথায়? ব্যক্তি হিসাবে আমার কতটুকু অধিকার ও সুযোগ আছে তা বিশ্লেষন করার ক্ষমতা অর্জন হলো ক্ষমতায়নের মূল কথা। ক্ষমতায়ন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় বিবেচনা করা হয় । যেমন ঃ-

ব্যক্তিগত: এপর্যায়ে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ধারণা বিবেচনা করা হয়।

সম্পর্ক: এ পর্যায়ে দেখা হয় ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতার সামর্থ্য অর্থাৎ ব্যক্তি কতটা মধ্যস্থতাকারী ও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারে কতটা সমর্থ।

সামষ্টিক: এ পর্যায়ে এক সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা। অথবা বড় আকারে প্রভাব বিস্তার ও তার ফল লাভের জন্য একসঙ্গে সক্রিয় থাকার সামর্থ। এক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করে নির্ধারণ করা যায় ক্ষমতায়নের মাত্রা।

ক্ষমতা অর্জন পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। ক্ষমতায়নের সাথে বেঁচে থাকার নানা ব্যবস্থা গভীরভাবে জড়িত। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো জটিল। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে কিনা তা বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হয় সম্পদের ওপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা অর্থাৎ নারী নিজে সম্পদ নিয়ন্ত্রন করছে কি না, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফল নারী ভোগ করতে পারছে কিনা। অর্থাৎ নারী সরাসরি উন্নয়নের সুফলভোগী কিনা। নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবার সমাজ বা গণজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরেন।

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম বা উপায় যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কোনও বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা, কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান। নারীর ক্ষমতায়নই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম চাবিকাঠি।

৩.২ নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক সমূহ

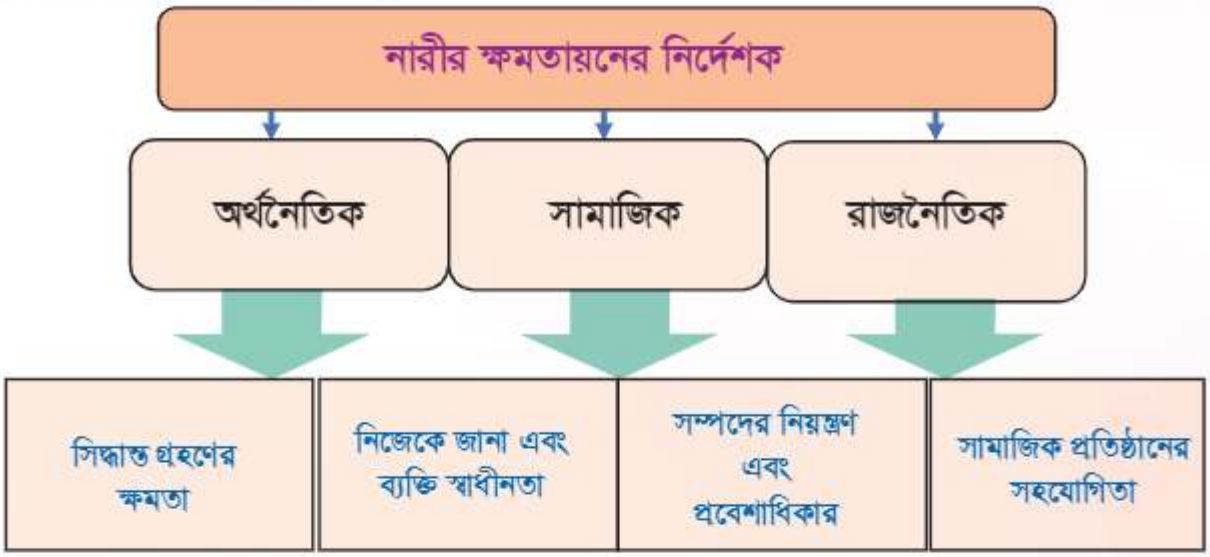

নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক বিষয়টিকে আমরা তিনটি ভাগে বিশ্লেষণ করতে পারি

১. **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন :** অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। আরো বিস্তারিতভাবে বললে বলা যায় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ,বাস্তবায়ন, অভিগম্যতা (Mobility), নিয়ন্ত্রণ এবং সমতার ভিত্তিতে সুফলভোগ করে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

২. **সামাজিক ক্ষমতায়ন:** সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে নারীর অধিকার ভোগের বিষয়টি প্রথমে আসে। সমাজে নারী কি কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার ব্যবহার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচ্য বিষয়।

৩. **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:** এটা হল রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচিত হওয়া এবং রাজনৈতিক দলে সমতার জায়গা কতটুকু নিশ্চিত তা বোঝায়।

নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে কিছু পদক্ষেপ

- কোনও জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদান ব্যবস্থা
- বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে ১০ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারা
- সরকারের সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) নারীর সমতা অর্জনের বিভিন্ন পদক্ষেপ এর কথা বলা হয়েছে।
- নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার
- নারীদের ব্যবসায়ে সমান সুযোগ তৈরী করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়।
- দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য সরকারের বহুমূখী প্রকল্প চালু আছে। যেমন: ভিজিডি, ভিজিএফ, দুস্থ ভাতা, মাতৃকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাবিখা, টাবিখা, একটি বাড়ী একটি খামার (আমার বাড়ি আমার খামার)

ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া; কোন ফলাফল নয়। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হল ক্ষমতায়নের একটি ফলাফল। ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় নারীর জাগরণ, আত্মবিশ্বাস/ আত্মবিকাশ, তার অধিকার, দক্ষতা এবং কর্মদক্ষতা থেকে।

৩.৩ নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী পদক্ষেপ সমূহ

- যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন -২০০০, সংশোধিত ২০০৩ ধারা ১০
- শিক্ষা বা কর্মপরিবেশে যৌন হয়রানী প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা- ১৪ই মে ২০০৯
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন - ২০১২ (৮এর ধারা ৩)
- তথ্য ও প্রযুক্তি আইন- ২০০৬, সংশোধিত ২০১৩ (ধারা ১৮)
- সরকারের আইন কমিশন কর্তৃক যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন -২০১০ (খসড়া)
- দন্ডবিধি ধারা ৫০৯
- গ্রাম্য আদালত এর মাধ্যমে সুলভে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
- গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা
- সকল কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠন।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা -২০১৩
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২
- ডিওক্সাইরিবোনুক্লিক এসিড (ডিএনএ) অ্যাক্ট -২০১৪
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি -২০১১
- ভিক্টিম সার্পোট (২০০৯) এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার -২০০১
- নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৩-২০২৫)
- মানব পাচার এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৫-২০১৭)
- সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮টি ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ৪০টি ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেল জেলা জেনারেল হাসপাতালে এবং ২০টি ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা প্রদান করছে ।
- জাতীয় ট্রমা পরামর্শ সেন্টার সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক পরামর্শ প্রদান করছে।

৩.৪: নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বা সুরক্ষায় কার্যক্রম সমূহ

১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ কমিটি এবং প্রতিরোধ সেল

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতিত নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১জন আইন কমকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদ নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালেই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৬টি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পটি বর্তমানে রাজস্বখাতভুক্ত হয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মসূচী হিসাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে।

২. মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

ক. **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল:** ৬টি বিভাগীয় শহরে সকল শ্রেণীর নির্যাতিত মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ, পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ ও পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন, সন্তানের ভরণ পোষন, দেনমোহরানা ও খোরপোষ আদায়, সব ধরনের আইনগত পরামর্শ দেয়া হয়।

খ. **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র:** নির্যাতিত, অসহায় ও আশ্রয়হীন মহিলাদের ২টি শিশু সন্তানসহ (অনধিক ১২ বছর) ৬ মাস আশ্রয় সুবিধা প্রদান, কেন্দ্রে থাকাকালীন বিনা খরচে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩. নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বা সুরক্ষায় পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটির করণীয়

পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর বলে গঠিত হয়। পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটি নারীর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে বা সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রাম অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক কাঠামো। গ্রাম্য চৌকিদার আইনের ১৮৭০ এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্ট্যান্ডিং/ স্থায়ী কমিটি রয়েছে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির অন্যতম একটি কমিটি হল পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটি। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পরিষদের বিভিন্ন এলাকার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী হয়। এ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক/ ত্রৈমাসিক সভায় এবং বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ প্রদান ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। পারিবারিক বিরোধ / নারী ও শিশু নির্যাতন / সংহিংসতা নিরসন সম্পর্কিত কাজগুলো করেন। পারিবারিক বিরোধ নিরসন/নিবারন নারী ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটি মাসিক/ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদের নিকট প্রদান করবে।পরিদর্শনের সময় পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা মহিলা কর্মী দলের সদস্যদের আত্ম-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করবেন।

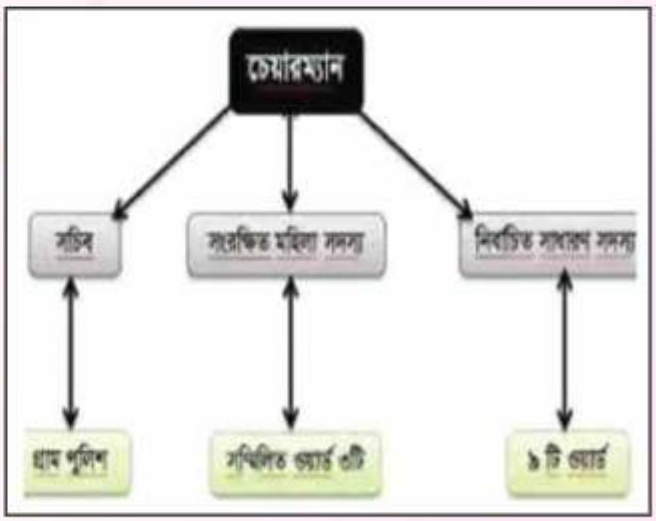

৩.৫ বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ

অধিকার অর্জন করতে হলে নিজেকে সচেতন হতে হবে। কারণ সচেতন না হলে অধিকার পেলেও তা ভোগ করা যাবেনা। এক্ষেত্রে পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে একটি লড়াই চলে আসছে যে নারী একজন ব্যক্তি কিনা,নারীর অধিকার কতটুকু দেয়া যায় এ বিষয়ে রয়েছে নানা তর্ক বিতর্ক। বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রেও অনেক অনুচ্ছেদ বিশেষ করে ২৬,২৭,২৮,২৯ এই সকল অনুচ্ছেদ গুলোতে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। যেমন ঃ বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের উত্তরাধিকার, পুত্র কন্যার সম্পত্তিতে সমঅধিকার, নারী পুরুষের সম্পত্তিতে সমঅধিকার ।

এ মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু গুলোতে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই ফলে বাংলাদেশে নারীর অধিকার, মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থান বিদ্যমান। নারী অধিকারের প্রশ্নে সাংবিধানিক ও আইনগত জোরালো সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকার কারণে আমাদের সমাজে নারীদের এখনো সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিদিনই অসংখ্য নারীর মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে, আমাদের দেশে নারীদের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা একদিকে যেমন ন্যায্য অধিকার ভোগ এবং আইনী সহায়তা প্রাপ্তির সুফল থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে বৈষম্যমূলক আইনের উপস্থিতি তাদের অবস্থাকে আরো বেশি নাজুক করে তুলছে। এই বাস্তবতায় নারীদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায্য অধিকার ভোগ করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত আইন, অধ্যাদেশ এবং সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়েছে।

- মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন -১৯৩৯
- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ১৯৭৪ সালে সংস্কার করা হয়। সেখানে অনেক জেন্ডার সংবেদনশীল ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়।
- সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৮৫
- যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০
- বাল্যবিবাহনিরোধ আইন-১৯৮৪
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ -১৯৮৫
- যৌন নির্যাতন নিরোধ আইন-২০০০
- এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২
- মানবপাচার প্রতিরোধ আইন -২০১২
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন -২০১০
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ সংশোধন-২০০৩
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন - ২০১২

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন এর মাধ্যমে পারিবারিক এ বৈষম্যপূর্ণ বিরোধপূর্ণ ধারা আইনগুলোর পরিবর্তন ও সংস্কারের চেষ্টা করছে এবং এ ক্ষেত্রে অনেক সফলতা এসেছে।

৩.৬: বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান নারীর অধিকারের প্রতি এক অসাধারণ স্বীকৃতি। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নারী-পুরুষে বৈষম্য করার কোনও সুযোগ নেই।

- সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী বলা হয়েছে। এজন্য নারীরা বাদী হয়ে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন।
- সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবেনা
- সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।
- সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদেও কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবেনা।
- সংবিধানের ২৯নং (১) অনুচ্ছেদে আছে প্রজাতন্ত্রতের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের সমতা থাকবে।
- সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবিধানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকলে নারীর প্রতি কোনও রকম বৈষম্য থাকার বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার সুযোগ নেই। এমনকি নারী উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় কোন উদ্যোগ নিলেও তা সংবিধান সমর্থন করবে, কিন্তু এসব আইন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র যথাযথ প্রয়োগের অভাবে এখনো অনেক নারীরা বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

৪. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিকারে করণীয় ও সহযোগিতা

উদ্দেশ্য :

- গ্রাম আদালত (Village Court) সম্পর্কে জানতে পারবেন
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুদের সহায়তার জন্য সরকারী মাল্টি-সেক্টরাল সেবাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন
- সহিংসতা প্রতিকারে ও সহায়তায় হট লাইন (Hotline) সমূহ জানতে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহনে সক্ষম হবেন

সময়: ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, অংশগ্রহনমূলক আলোচনা, ছবি প্রদর্শন

গ্রাম আদালত

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে গ্রাম আদালত। গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু মামলার নিষ্পত্তি এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয়াবলীর বিচার সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে গ্রামআদালত অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় গঠিত একটি স্থানীয় মীমাংসামূলক তথা সালিশি আদালত। তাই গ্রামীণ সাধারণ, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় বিচারিক সেবা পৌঁছাতে গ্রাম আদালত প্রবর্তন করা হয় ।

৪.১ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত ধারণা

গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যে আদালত গঠিত হয় সে আদালত হলো গ্রাম আদালত।

- গ্রামআদালত একটি আদালত যা গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০১৩ দ্বারা পরিচালিত।
- গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ নিস্পত্তি করতে পারে।
- উভয় পক্ষের মনোনীত ৪(চার) জন সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ মোট ৫(পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন গ্রাম আদালতের প্রধান।
- গ্রাম আদালতে ফৌজদারী মামলার ফি ১০ টাকা ও দেওয়ানী মামলার ফি ২০টাকা ফি দিয়ে গ্রাম আদালতে গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সর্বোচ্চ ৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের ছোটখাটো বিরোধ স্থানীয়ভাবে কম সময়ে নিস্পত্তি করতে পারেন। উচ্চ আদালতে যেখানে একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে কমপক্ষে ১-২ বছর সময় লাগে, সেটি গ্রাম আদালতে নিস্পত্তিতে গড়ে সময় লাগে মাত্র দেড় মাস।
- কোন মামলায় নারীর স্বার্থ এবং ফৌজদারী মামলায় নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক অবশ্যই একজন নারী প্রতিনিধি মনোয়ন করার বিধান রয়েছে।
- শুধু বিচারে আবেদনকারী নারী হিসাবেই নয়, গ্রাম আদালতের বিচারিক প্যানেলেও নারীদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী নিজেরাই নিজেদের কথা বলতে পারেন তাই আইনজীবির দরকার হয়না।
- গ্রাম আদালতে জেল বা অন্যান্য শাস্তির বিধান নেই।

গ্রাম আদালত যেসব বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে

- চুরি, ঝগড়া- বিবাদ, কলহ বা মারামারি, দাঙ্গা, প্রতারণা, ভয়ভীতি দেখানো বা হুমকি দেয়া, কোনো নারীর শালীনতাকে অমর্যাদা বা অপমানের উদ্দেশ্যে কথা বলা, উত্যক্ত করা।
- গচ্ছিত কোনো মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, পাওনা টাকা আদায়, স্থাবর সম্পত্তির দখল ও পুনরুদ্ধার, অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার বা তার মূল্য আদায়, কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়।
- গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ, গবাদিপশু মেরে ফেলা বা গবাদি পশুর ক্ষতি করা।
- কৃষি শ্রমিকের পরিশোধযোগ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি।

গ্রাম আদালতে আবেদন দাখিল প্রক্রিয়া

- আবেদনকারীকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে যথাযথ ভাবে পূরণ করে অথবা সাদা কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
- পূরণকৃত আবেদন পত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করতে হবে
- ফৌজদারী মামলার জন্য ১০ টাকা এবং দেওয়ানী মামলার জন্য ২০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে এবং রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন খরচ নেই।
- ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধ সংগঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করতে হবে।
- দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মামলার বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ৬০দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে। তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার দিন থেকে ১ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করা যাবে।

নোট: গ্রামআদালত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিজ জেলার "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প-" স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সাথে যোগাযোগ করুন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের সেবাসমূহ

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুদের সহায়তায় জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের সেবাসমূহ

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (আদালত) আইনি

- আইনি পরামর্শ দেওয়া
- মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সহযোগিতা করা
- ডিএনএ টেষ্টের ব্যয়ভার বহন করা
- আইনগত অধিকারের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীতে সহযোগিতা করা

থানা - পুলিশি সেবা

- অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত করা
- পুলিশি তত্ত্বাবধানে জরুরি চিকিৎসা সেবা ও আশ্রয় নিশ্চিত করা ।
- বাল্য বিবাহ, নারী পাচার, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-সামাজিক সেবা

- নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সহযোগিতা করা
- জেলা কোর্ট হতে পাঠানো মামলার তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং কোর্টে প্রেরণ করা
- আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করা
- মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

হাসপাতাল -স্বাস্থ্য সেবা

- শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হলে
- আঘাত ব্যবস্থাপনা ও তদারক করা
- ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ধর্ষণের আলামত সংগ্রহ করা
- ৭২ ঘন্টার মধ্যে এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে চিকিৎসা দেওয়া
- ১২০ ঘন্টার মধ্যে গর্ভনিরোধে জরুরি ব্যবস্থা
- ১৪ দিনের মধ্যে হেপাটাইটিস -বি টিকা প্রদান করা
- মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

সমাজ সেবা কার্যক্রম- সামাজিক নিরাপত্তা সেবা

- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদান করা ও নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র বা সেফ হোমে থাকার ব্যবস্থা করা
- জোরপূর্বক এবং প্রতারণার শিকার হয়ে যৌনকাজে ও অন্যান্য অনাচারে নিয়োজিতদের দেখাশোনা ও নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা হেফাজতে থাকাকালীন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া
- এসিড দগ্ধ নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা

৪.২: সহিংসতা প্রতিরোধ / সাহায্যে হট লাইন সমূহ

জেন্ডার (লিঙ্গ) ভিত্তিক / নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিকারে করণীয় ও সহযোগিতা

সূত্র: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প

স্বপ্ন উপকারভোগীদের সহিংসতা/ নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক প্রতিবেদন ছক

গ্রাম: **ইউনিয়ন:** **উপজেলা:** **জেলা:**

ক্রমিক নং	স্বপ্ন উপকার ভোগীর নাম	বয়স	স্বপ্ন আইডি নং	সহিংসতার কারণ ▪ যৌতুক ▪ টাকা ধার ▪ সময়মত কাজ শেষ করতে না পারা ▪ পারিবারিক শত্রুতা বিবাহতে রাজী না হওয়া	সহিংসতার ধরণ (শারীরিক/ মানসিক/ যৌননির্যাতন) ▪ মারামারি ▪ এসিড নিক্ষেপ ▪ কেরেসিন ঢেলে দেওয়া ▪ আগুন লাগিয়ে দেয়া ▪ অন্যান্য (বকাবকা/ হয়রানি/জোরপূর্বক জমি দখল	ঘটনার স্বীকার হয়েছেন ▪ নিজ ▪ ছেলে/ মেয়ে ▪ পরিবারের অন্য সদস্য (নির্দিষ্ট করুন)	ঘটনার তারিখ	মীমাংসার ধরন ▪ সালিশ ▪ গ্রাম আদালত ▪ থানায় ফাইল ▪ কিছুই করেন নাই	প্রথম রিপোর্টের তারিখ	বর্তমান অবস্থা ▪ মীমাংসিত ▪ অমীমাংসিত ▪ অমীমাংসিত অবস্থায় কেস চলছে/বন্ধ

নোট: ইউনিয়নকর্মী হিসাবে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন / পরামর্শ দিয়েছেন তা লিখুন:

ইউনিয়ন কর্মীর নাম: প্রজেক্ট অফিসারের নাম

স্বাক্ষর: স্বাক্ষর :

তারিখ: তারিখ:

বিশেষ নোট :

প্রতি ৩ মাস অন্তর ইউনিয়ন কর্মীগণ দলীয় সভায় এ তথ্য সংগ্রহ করবেন। তথ্য সংগ্রহের সময় ইউনিয়ন কর্মী উপকারভোগীকে কি ধরনের সহায়তা প্রদান করেছেন তা নোট আকারে উল্লেখ করে এবং প্রজেক্ট অফিসারকে প্রতিবেদন জমা দিবেন। প্রজেক্ট অফিসার তার অধীনস্ত কর্মীদের তথ্য - উপাত্ত একত্রিত করে প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর এর নিকট জমা দিবে। প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সকল তথ্য ও উপাত্তের আলোকে বিস্তারিত রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরী (ইংরেজীতে) করে স্বপ্ন জেলা ব্যবস্থাপকের অফিসে জমা দিবেন এবং ব্যবস্থাপক এ প্রতিবেদন যাচাই বাছাই করে জেলার প্রতিবেদনে সম্পৃক্ত করে স্বপ্ন ঢাকা অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন ।

কেস ষ্টাডি

সীমা ঃ নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মোহাম্মত শিউলি আকতার সীমা, বয়স-২৭ বৎসর। উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্পের কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি উপজেলার বান্ধবের ইউনিয়নের ১ম চক্রের একজন স্বপ্ন কর্মী। বাবা কৃষি কাজ করেন। ২ ভাই আর ২ বোন নিয়ে তাদের পরিবার মোটামুটি চলছিল। সীমা স্কুলে পড়াশুনা ও করছিলেন। এর মধ্যে পাশের বাড়ীর অবস্থাপন্ন মো: শফিকুল ইসলামকে ভালবেসে কাউকে না জানিয়ে ২০১১ সালে ১ লক্ষ টাকা দেনমোহরানায় দুজনে বিয়ে করেন। তখন দুজনেই ছাত্র। বাড়ীর কেউ এ বিয়ে মেনে নেবেনা তাই তারা গোপন রাখে। বিয়ের পর সীমা বাবার বাড়ীতেই থাকতে শুরু করে। এর মধ্যে সীমা দশম শ্রেনীর ছাত্রী ,অন্য ভাইবোন ও লেখা পড়া করছে। বাবার পক্ষে সংসারের খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে তাই সীমা পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। শফিকুলকে বার বার তাগিদ দেয়া সত্বেও সে বিয়ের কথা পরিবারের কাছে প্রকাশ করতে দেয়না। একদিন সীমা সাহস করে তার বাবা মাকে জানায়। সীমার বাবা মা বিয়েটা মেনে নেয় কিন্তু শফিকুলের বাবা মা কিছুতেই মেনে নেয়না কারন শফিকুলদের চেয়ে সীমারা অনেক গরিব। সীমা বাবার বাড়ীতেই থাকতে লাগল। শফিকুল দেখতে সুন্দর, লেখাপড়াও করছে। সীমার কথায় অনেক দিন পর শফিকুল তার পরিবারকে বিয়ের কথা বলে। শফিকুলের পরিবার, ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যৌতুক এর বিনিময়ে এ বিয়ে মেনে নিয়ে সীমা কে ঘরে নিতে রাজী হয়।

কিন্তু সীমার পরিবার এর পক্ষে এত টাকা দেয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু শফিকুল ও অনড় ছিল টাকা না পেলে সে সীমা কে তার বাড়ীতে আনতে পারবেনা। এর মধ্যে সীমা সন্তানসম্ভবা হয় এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। তবুও শফিকুল ও তার পরিবার যৌতুকের ব্যাপারে একই অবস্থানে থাকে। আস্তে আস্তে শফিকুল সীমার বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দিল, এমনকি সীমা আর তার মেয়ে সুরভীর কোন খোঁজ খবর রাখেনা। এর মধ্যে শফিকুল এম এ পাশ করে ব্যবসা শুরু করেছে।

সীমা ভাবল বাবার পরিবারে কতদিন এভাবে চলবে, বাবার বয়স হচ্ছে। তাকে কোন একটা কাজ করে পরিবার ও তার সন্তানকে চালাতে হবে। ২০১৫ সালে সীমা স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ইউএনডিপি পরিচালিত স্বপ্ন প্রকল্পের ১৮ মাস মেয়াদী রাস্তাঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সুযোগ পায়। দৈনিক ২০০ টাকা হারে একাজ করে। প্রতিদিন সে কাজের জন্য ১৫০ টাকা হাতে পেত আর বাকি ৫০টাকা ব্যাঙ্কে জমা হতে থাকে, সীমা এককালীন আনুমানিক ২২হাজার টাকা হাতে পায়।

সীমার ভাষ্যমতে, "স্বপ্ন প্রকল্পে রাস্তার কাজের পাশাপাশি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়েছি, যা আমাকে কি করে জীবনমান উন্নয়ন করা যায় ও নারী হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা শিখিয়েছে। ২০১৭ সালে সীমা গাজীপুরে অবস্থিত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইকোফ্যাব লিমিটেড এ স্বপ্ন প্রকল্প আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে। প্রশিক্ষণ শেষে ঐ ফ্যাক্টরীতেই মেশিন অপারেটর হিসাবে কাজে যোগ দেয়। সীমার মেয়ে তার বাবা মার কাছে গ্রামের বাড়ীতেই বড় হতে থাকে। এ দিকে শফিকুল এর পরিবার শফিকুলকে আবার তাদের পছন্দ করা পাত্রীর সাথে বিয়ে করাতে চায়। ওরা বিবাহ বিচ্ছেদ এর মামলা করে, এটা জেনে সীমাও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে। সীমার একটাই কথা ছিল হয় তাকে শ্বশুরবাড়ীতে তুলতে হবে অথবা তার দেনমোহরানার টাকা ও মেয়ের ভরন পোষন দিতে হবে।

প্রায় ১ বছর ধরে অনেক আলাপ আলোচনা আর কোর্টে হাজিরা দিয়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দুই পক্ষের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সীমা বলে "আমি আমার অধিকার আদায়ে অনড় ছিলাম আর এ শক্তি আমি স্বপ্নের কর্মী বলেই করতে পেরেছি। আদালতও আমার প্রতি সুবিচার করেছেন। আমি দেনমোহরের ১ লক্ষ টাকা আদায় করতে পেরেছি আর আমার মেয়ের ভরনপোষন বাবদ মাসিক ২০০০ টাকা করে দেয়ার আদেশ আদালত থেকে পেয়েছি। সীমা এখন ইকোফ্যাবে একজন দক্ষ জয়েন্ট অপারেটর হিসাবে কাজ করছে। প্রতিমাসে ১২০০০ টাকা বেতন পান; ওভার টাইম হলে আরো বেশী পান।

ইকোফ্যাবে সীমার আর ও একটি পরিচয় আছে তা হলো FIRE FIGHTER সীমার কাজের দক্ষতা, সাহস, ইতিবাচক মনোভাব আর সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের জন্য ইকোফ্যাব সীমাকে FIRE FIGHTER এর প্রশিক্ষণ দেয়। সীমা ইকোফ্যাবের FIRE FIGHTER দলের একজন দক্ষ সদস্য ।

সীমার কিছু কথা

প্রথম যখন গার্মেন্টেস এ চাকুরীর জন্য প্রশিক্ষন নিতে আসি তখন পাড়ার লোকজন, প্রতিবেশী এমনকি বাবা মা ও বলল অনেক কষ্ট হবে, জোয়ান মেয়ে বিক্রি করে দিবে ইত্যাদি নানা কথা। কিন্তু এসে দেখি একেবারে উল্টো। আমি খুব নিরাপদে প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং নিরাপদ পরিবেশে কাজ করছি। এমনকি যেখানে থাকি সেখানেও কোন সমস্যা নাই।

গার্মেন্টস এ আমাকে এখন সবাই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। অনেক পরিচিতি বেড়েছে। আগুন থেকে নিরাপদে থাকা এবং আগুন থেকে উদ্ধার করতে পারা আমার জানা আছে। আমি এখন আত্মনির্ভরশীল, এখন গ্রামের চেয়ারম্যানরা বলে "সীমা তুই দেখাইয়া দিলি"। বাড়ীতে গেলে সবাই আমার কাছে ছুটে আসে, আমার কথা শুনতে চায়, পরামর্শ চায়। ভবিষৎ এ যেন ভাল ভাবে চলতে পারি তাই এখন থেকে আমি নিয়মিত সঞ্চয় করি। প্রতিমাসে চাকুরীর বেতন থেকে ৫০০০ টাকা ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করি। দেন মোহরের ১ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ডিপিএস করে রেখেছি। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছি, বাবা-মার কাছে থাকে। প্রতিমাসে মেয়ের ভরনপোষনের ২০০০ টাকা দিয়ে ওর সব খরচ মিটাই। মেয়েকে মানুষের মত মানুষ করা আর বাবামার দুঃখ দূর করাই আমার ইচ্ছা। আমার মত মেয়েরা যারা পিছিয়ে আছে তারা যেন নিজের পায়ে দাড়াতে পারে তার জন্য সাহায্য করা। তবে আমি আর বিয়ে করবনা, নারীরা যে নিজেই নিজের পায়ে দাড়িয়ে একা চলতে পারে আমি তাই করে দেখাবো। এটাই আমার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন আমি জেগে দেখি এ স্বপ্ন আমাকে ঘুমাতে দেয়না। আমাকে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দেয় ।

সীমা স্বপ্নকর্মী থেকে একজন ফায়ার ফাইটার

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

১. নারী-পুরুষের সম্পর্ক- উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ-২০১৯

২. করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ও নানাবিধ প্রভাব- বনিক বার্তা - মে, ২০২০

৩. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-(২০১৫-১৬, ২০১৯-২০) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪. স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা- এন আইএলজি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -২০০৯

৫. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-২০১১।

৬. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মে -২০১৩

৭. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

৮. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০

৯. বাংলাদেশ গেজেট অক্টোবর, ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ।

১০. জেন্ডার, পুরুষালি এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল- ব্রাক, ইউএনডিপি, কঙওঈঅ- ২০১৫

১১. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট জেন্ডার নীতি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৮

১২. লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সচেতনতা- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প -স্থানীয় সরকার বিভাগ, -স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ, ইউকে এইড- আগষ্ট ২০১৯

১৩. ন্যায় বিচারের অধিকার নারী ও পুরুষ সবার- বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প- ২০১৮

১৪. পকেট কার্ড- বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প- ২০১৮

১৫. Gender mainstreaming in Education, Trainers manual- NAEM -MOE and MOWCA

১৬. Gender Based Violence- An advocacy guide for grass root actvits – CARE- Burundi

১৭. জেন্ডার শব্দকোষ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১।

১৮. জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন রোধে ষ্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস, (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল)- বাংলাদেশ পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-২০১৬

১৯. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকার

২০. বাংলাদেশের সংবিধান- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১. Picture: Women Violence Png, Free Transpartent ..... Clipartkey.com

সংযুক্তি

১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০

৩. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, মে ২০১৩- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ ৫-১১

১. ভূমিকা

২. পটভূমি

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

৪. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

৫. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট

৭. নারী ও আইন

৭.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

৭.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

৭.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

৯. নারী মানবসম্পদ

১০. রাজনীতি ও প্রশাসন

১১. দারিদ্র্য

১২. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ

১৩. সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা,

১৪. সম্পদ ও অর্থায়ন

১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

দ্বিতীয় ভাগ ১২-১৮

১৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১৭. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

১৮. কন্যা শিশুর উন্নয়ন

১৯. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ

২০. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা

২১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

২২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

২৩. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

২৪. নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

২৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

২৬. নারীর কর্মসংস্থান

২৭. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন

২৮. সহায়ক সেবা

২৯. নারী ও প্রযুক্তি

৩০. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

৩১. নারী ও কৃষি

৩২. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩৩. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

৩৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৩৫. গৃহায়ণ ও আশ্রয়

৩৬. নারী ও পরিবেশ

৩৭. দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

৩৮. অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৩৯. প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৪০. নারী ও গণমাধ্যম

৪১. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী

তৃতীয় ভাগ **১৯-২২**

৪২. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল,

৪২.১ জাতীয় পর্যায়

৪২.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়

৪২.৩ তৃণমূল পর্যায়

৪৩. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

৪৪. নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

৪৫. নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

৪৬. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল

৪৭. আর্থিক ব্যবস্থা

৪৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

৪৯. নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

প্রথম ভাগ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

২. পটভূমি

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তার এ আহবানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত: শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্থানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষতঃ শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; এবং (৬) মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তিপ্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় "দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল" নামে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত "গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর" কাজও শুরু হয়।

দ্বিবার্ষিক (১৯৭৮-১৯৮০) নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) একই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকেই আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

৪. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে নারী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন; গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। একই সময় Optional Protocol on CEDAW-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৫. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদ আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন"। ২৮(৩)-এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না"। ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। ২৯(১) এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"। ২৯(২) এ আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না"। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচী। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দরিদ্র মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Rural Non Farm Activities এর

উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয় কৌশলপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

৭.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

৭.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।

৭.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের তফসিলে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন রয়েছে। এখনও নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও কন্যা শিশু অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। গ্রাম্য সালিশির মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ন্যাশনাল ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং পাঁচটি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয়না এবং বিভিন্ন কারণে বিচার বিলম্বিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর সহায়তার জন্য বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ছয়টি বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশী সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও হেল্প লাইনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যথাক্রমে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং ইউনিয়েন ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিসমূহে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।

৯. নারী মানবসম্পদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। সরকার নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচী ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত" ফলপ্রসূ হয়েছে। স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদানে সরকার সচেষ্ট। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অবস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ঘটেছে। নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার সচেষ্ট। নারীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দশটি নারী বান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০. রাজনীতি ও প্রশাসন

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভূক্তি তথা উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারি চাকরিতে মেয়েদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবারিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে দু'জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিতেও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচক। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদের উপনেতা নারী। মন্ত্রিসভায় ৬ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত ও ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী রয়েছেন। জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেন। শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক পদে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পর্যায়ে তিন জন এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চার জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রদূত পদে তিন জন নারী বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচ জন নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন। ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তদসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (ফিমেল আর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে।

১১. দারিদ্র্য

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অর্ন্তভূক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১২. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক উত্তরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর

গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নামকরণ "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৪৪ টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)" গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্ত:মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

১৩. সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৪. সম্পদ ও অর্থায়ন

নারী উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী হতে সহায়তার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমানহারে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক সারা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে ইউএন উইমেন (UN Women) নামক একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইউএন উইমেন (UN Women) থেকে নারী উন্নয়নে সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা, সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী ও শিশু বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, নারী ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক পরিষদের কার্যক্রম, উইড ফোকাল পয়েন্ট কার্যক্রম সমন্বয়, নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজের কাজের সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম বার্ষিকী পালন, বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন, রোকেয়া পদক প্রদান, শিশুর উন্নয়ন বিষয়ে ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

দ্বিতীয় ভাগ

১৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১৬.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.২ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৬.৩ নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

১৬.৪ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৬ নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।

১৬.৭ নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১৬.৮ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।

১৬.৯ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

১৬.১০ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।

১৬.১১ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।

১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.১৩ নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

১৬.১৪ নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.১৫ নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

১৬.১৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৬.১৭ প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৬.১৮ বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১৬.১৯ গণ মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা সহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

১৬.২০ মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

১৬.২১ নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

১৬.২২ নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

১৭. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

১৭.১ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।

১৭.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৩ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৭.৪ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

১৭.৬ বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।

১৭.৭ গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

১৭.৮ মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

১৭.৯ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

১৮. কন্যা শিশুর উন্নয়ন

১৮.১ বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

১৮.২ কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৮.৩ কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।

১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।

১৮.৫ কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

১৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশু যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৮.৭ কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৮.৮ প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৯. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ

১৯.১ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা

১৯.২ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৯.৩ নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৪ নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।

১৯.৫ নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৯.৬ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।

১৯.৭ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

১৯.৮ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৯ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৯.১০ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৯.১১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

২০. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা

২০.১ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২০.২ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

২০.৩ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা।

২১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

২১.১ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

২১.২ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত: কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

২১.৩ কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।

২১.৪ মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

২২.১ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২২.২ স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

২২.৩ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২২.৪ নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।

২৩. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

২৩.১ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।

২৩.২ অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

২৩.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।

২৩.৪ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety nets) গড়ে তোলা।

২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।

২৩.৬ শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

২৩.৭ নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

২৩.৮ নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

২৩.৯ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৩.১০ সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

২৩.১১ নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৪. নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

২৪.১ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।

২৪.২ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৪.৩ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

২৪.৪ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

২৪.৫ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

২৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি)

২৫.১ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

২৫.২ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

২৬. নারীর কর্মসংস্থান

২৬.১ নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২৬.২ চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২৬.৩ সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

২৬.৪ নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২৬.৫ নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।

২৬.৬ নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

২৭. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন

২৭.১ নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

২৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive) Budgeting, GRB) অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা।

২৭.৩ জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

২৮. সহায়ক সেবা

সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

২৯. নারী ও প্রযুক্তি

২৯.১ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

২৯.২ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২৯.৩ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

৩০. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

৩০.১ দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩০.২ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩০.৩ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩১. নারী ও কৃষি

৩১.১ কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩১.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকাপ সহায়তা প্রদান করা।

৩১.৩ কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩১.৪ কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩২. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩২.১ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.২ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৩ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৩২.৪ নির্বাচনে অধিকহারে নারী পার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৩২.৫ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৬ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩২.৮ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩২.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

৩৩. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

৩৩.১ প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral entry) ব্যবস্থা করা।

৩৩.২ প্রশাসনিক, নীতি নিধারনী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।

৩৩.৩ জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/ মনোনয়ন দেয়া।

৩৩.৪ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশপর্যায় সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

৩৩.৫ সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।

৩৩.৬ কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।

৩৩.৭ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৩৪.১ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.২ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

৩৪.৩ মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা।

৩৪.৪ এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কীত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩৪.৫ নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩৪.৬ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

৩৪.৭ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৩৪.৮ উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৪.৯ পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৪.১০ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৪.১১ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

৩৫. গৃহায়ণ ও আশ্রয়

৩৫.১ পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত করা।

৩৫.২ একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীনারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষনার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

৩৫.৩ নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোস্টেল, ডরমিটরী, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।

৩৬. নারী ও পরিবেশ

৩৬.১ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

৩৬.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩৬.৩ কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

৩৭. দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.২ নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।

৩৭.৩ দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

৩৭.৪ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।

৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

৩৮. অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৩৮.১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৮.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৮.৩ অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩৯. প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম ঃ

৩৯.১ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।

৩৯.২ প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৩৯.৩ যে সমস্থ নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অর্ন্তভূক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

৩৯.৪ প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩৯.৫ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালন পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা।

৩৯.৬ প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।

৪০. নারী ও গণমাধ্যম

৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪০.৪ প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

৪১. বিশেষ দুদর্শাগ্রস্থ

নারী যদি কোন নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দুর্দশাগ্রস্থ হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।।

তৃতীয় ভাগ

৪২. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪২.১ জাতীয় পর্যায়

ক) **নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) **জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD):** নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদে কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নূতন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

(৩) নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

(৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

(৫) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

(৬) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

গ) **সংসদীয় কমিটি:** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) **নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট:** বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যূনতম পক্ষে যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হবে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া, ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় ও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট:** মন্ত্রণালয় ও সরকারী বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করা হবে। এই কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ প্রদান করবে।

৪২.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৪২.৩ তৃণমূল পর্যায়

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অর্ন্তভূক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪৩. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসকারী উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ক. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল কর্মকান্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

খ. জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তাদান এবং এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নরত নারী সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উল্লেখিত ধরণের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সংগঠন সমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা হবে।

৪৪. নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৪৫. নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরী, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৪৬. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল

৪৬.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমূহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৪৬.২ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

৪৬.৩ সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।

৪৬.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

৪৬.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএটিসি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

৪৬.৬ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৪৬.৭ সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ে ক সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসকারী সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।

৪৬.৮ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

৪৭. আর্থিক ব্যবস্থা

৪৭.১ তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি) অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

৪৭.৩ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৪৭.৪ জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.৫ পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৪৭.৬ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আর্ন্তজাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪৭.৭ বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৪৯. নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৮ নং আইন)

[১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০]

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,

(ক) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(খ) "অপহরণ" অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা;

(গ) "আটক" অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা;

(ঘ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(ঙ) "ধর্ষণ" অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code, 1860 (Act SLV of 1860), এর Section 375 এ সংজ্ঞায়িত rape";

(চ) "নবজাতক শিশু" অর্থ অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের কোন শিশু;

(ছ) "নারী" অর্থ যে কোন বয়সের নারী;

(জ) "মুক্তিপণ" অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা,

(ঝ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ, (Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

[১][(ঞ) "যৌতুক" অর্থ

(অ) কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা

(আ) কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ,

(ট) "শিশু" অর্থ অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি;

(ঠ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি

৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবেন।

নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

৫। (১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছেন তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

৬। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক, ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন

নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি

৭। যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি

৮। যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়রে উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা-যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত [২][ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলক ভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা [৩][ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষন করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরি ভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি

[৪] [৯ ক। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilful) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন]

যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড

[৫] [১০। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন] ।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি

১১। যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন ৬ [কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন] তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

[৭] [(খ) মারাত্মক জখম (grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন]

ভিক্ষাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি

১২। যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান

[৮] [১৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তানকে তাহার মাতা কিংবা তাহার মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে;

(খ) উক্ত সন্তান তাহার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে;

(গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহণ করিবে;

(ঘ) উক্ত সন্তানের ব্যয় তাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে, তবে একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে

(৩) এই ধারার অধীন কোন সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।]

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ

১৪। (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন

ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে অর্থদণ্ড আদায়

১৫। এই আইনের ধারা ৪ হইতে ১৪ পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা উক্ত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাইবে।

অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি

১৬। এই আইনের অধীনে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে

মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি

১৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালউপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

অপরাধের তদন্ত

৯ [১৮। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সপোন্দ হইলে তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পনের কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; অথবা।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে ধৃত নাহইলে তাহার অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ট্রাইব্যুনালের নিকট হইতে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ষাট কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে

(২) কোন যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখ পূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন অপরাধের

তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সপোন্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী সাত কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন

(৬) উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবো।

(৭) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনালতদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৮) যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত। সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা মামলার প্রমাণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৯) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন তদন্তকারী। কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

[১০] [১৯ (১) এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্যঅপরাধ সংঘটনে জড়িত মূল এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হন

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নারী বা শিশু হইলে কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থ (sick or infirm) হইলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যার্য বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যাযসংগত হইবে মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে তদমর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালজামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।

বিচার পদ্ধতি

২০। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা চলিবে

(৩) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালবিচারকার্য সমাপ্ত করিবে

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে ট্রাইব্যুনালউহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যে পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার । স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[১১] (৬) কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইব্যুনালস্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধের বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে (trial in camera) অনুষ্ঠান করিতে পারিবো।

(৭) কোন শিশু এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে বা উক্ত অপরাধের সাক্ষী হইলে তাহার ক্ষেত্রে, (Children Act, 1974 (xxxix of 1974) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

[১২] [(৮) কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, উক্ত নারী বা শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থে তাহার মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা করিবে]।

আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার

২১। (১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সপোন্দকরণ এড়াইবার জন্য। পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং

(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালঅন্তত: দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালতাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালকর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ। লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা

২২। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অকুস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন। এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের তৃরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালউক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনালঅভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্য

২৩। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন চিকিৎসক, রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনালঅভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না

সাক্ষীর উপস্থিতি

২৪। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য সাক্ষীর সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীকে উক্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করিলে ট্রাইব্যুনাল উহাকে অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি

২৫। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং ট্রাইব্যুনালএকটি দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ বা তদনুসারে অন্য কোন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে

(২) ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল

২৬। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করিয়া ট্রাইব্যুনালথাকিবে এবং প্রয়োজনে সরকার উক্ত জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনালও গঠন করিতে পারিবে; এইরূপ ট্রাইব্যুনালনারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালনামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, কোন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় জেলা জজ ও দায়রা জজ বলিতে যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

২৭। ১৩ (১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না

(১ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া,

(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুসন্ধানের () জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন;

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কোন ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,

(ক) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত রিপোর্ট ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিংবা অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি নাকচ করিবেন

(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্টে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন]

(২) যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যেখানে অপরাধীকে বা, একাধিক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান বা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন, সেই ট্রাইব্যুনালে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং সেই ট্রাইব্যুনাল অপরাধটির বিচার করিবে

(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে

আপীল

২৮। ট্রাইব্যুনালকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন

২৯। এই আইনের অধীনে কোন ট্রাইব্যুনাল, মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাইবে না।

অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি

৩০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।

নিরাপত্তামূলক হেফাজত

৩১। এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে, কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাহিরে ও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির জবাবদিহিতা

[১৪] [৩১ক। (১) কোন মামলা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইবার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালকে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রতিবেদন ত্রিশ দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) অনুরূপ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকেও উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রতিবেদন ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করিতে হইবে

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন পেশকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা

[১৫] [৩২। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা সরকারী হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারী হাসপাতালে সম্পন্ন করা যাইবে

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হইলে, উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাহার মেডিক্যাল পরীক্ষা অতিদ্রুত সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কোন মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, মেডিক্যাল পরীক্ষার আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাইব্যুনালবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে]।

[৩২। (ক) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ধারা ৩২ এর অধীন মেডিকেল পরীক্ষা ছাড়া ও উক্ত ব্যক্তি সম্মতি থাকুন বা না থাকুক, ডিঅক্সিরাইবোণিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা আইন ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) বিধান অনুযায়ী ডিঅক্সিবাইবোণিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরিক্ষা করিতে হইবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩৩। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯৯৫ সনের ১৮ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত

৩৪। (১) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে এমনভাবে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত করা হয় নাই।

(৩) উক্ত আইনের অধীন অপরাধের কারণে যে সমস্ত মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তপ্রেক্ষিতে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে, বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সমস্ত মামলাও উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত আদালতে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইনের অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত সমূহ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপ-ধারা (২) অনুসারে উহাতে উল্লিখিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

..... ১ দফা (ঞ) এবং (ট) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২"ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৩ "ষোল বৎসরের" শব্দগুলি "চৌদ্দ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৪ ধারা ৯ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত

৫ ধারা ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৬ "কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম ( ) করেন বা সাধারণ জখম ( ) করেন" শব্দগুলি এবং বন্ধনীগুলি ", উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন," কমাগুলি এবং শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৭ দফা (খ) ও (গ) পূর্ববর্তী দফা (খ) এর পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৮ ধারা ১৩ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

৯ ধারা ১৮ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১০ ধারা ১৯ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১১ উপ-ধারা (৬) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১২ উপ-ধারা (৮) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে সংযোজিত

১৩ উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ) এবং (১গ) পূর্ববর্তী উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১৪ ধারা ৩১ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে সন্নিবেশিত

১৫ ধারা ৩২ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

১।	বিধিমালার নাম	৫
২।	সংজ্ঞা	৫
৩।	প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট পারিবারিক সহিংসতার তথ্য প্রদান, ইত্যাদি	৫
৪।	প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব	৫
৫।	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা	৫
৬।	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব	৬
৭।	পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব	৬
৮।	আদালত বরাবর আবেদন করিবার পদ্ধতি	৬
৯।	সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আবেদন	৬
১০।	মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব	৬

ফরম-কঃ

পারিবারিক সহিংসতার তথ্য বিবরণী ৭

ফরম-খঃ

রেজিস্টার ১০

ফরম-গঃ

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম ১১

ফরম-ঘঃ

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য রেজিস্টার ১২

ফরম-ঙঃ

থানায় সংরক্ষিত তথ্য রেজিস্টার ১৩

ফরম-চঃ

আবেদন ফরম ১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৬ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২৯ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ। এস,আর,ও নং ১১৬/আইন/২০১৩ - পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। **বিধিমালার নাম**।- এই বিধিমালা পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) **"আইন"** অর্থ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন);

(খ) **"তথ্যকণিকা"** অর্থ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তিকা;

(গ) **"পারিবারিক সহিংসতা"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এ পারিবারিক সহিংসতা অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ঘ) **"প্রয়োগকারী কর্মকর্তা"** অর্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক আইনের ধারা ৫ অনুসারে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার কোন ফরম;

(চ) "মন্ত্রণালয়" অর্থ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; এবং

(ছ) **"সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি"** অর্থ কোন শিশু বা নারী যিনি পারিবারিক সম্পর্ক থাকিবার কারণে পরিবারের অপর কোন সদস্য কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতার শিকার হইয়াছেন বা হইতেছেন বা সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছেন।

৩। **প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট পারিবারিক সহিংসতার তথ্য প্রদান, ইত্যাদি**।- (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, পারিবারিক সহিংসতামূলক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি এখতিয়ার সম্পন্ন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে ফরম-ক অনুযায়ী লিখিতভাবে, অথবা মৌখিকভাবে অথবা টেলিফোন, মোবাইল বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ফরম-খ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার অনুলিপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তথ্য প্রদানকারীকে বিনামূল্যে সরবরাহ করিবেন।

৪। **প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব**।- (১) আইনের ধারা ৬ এর উপ ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং উক্ত ধারার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে, যথা:

(ক) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনে প্রদত্ত অধিকার ও প্রতিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও বিনামূল্যে তথ্যকণিকা প্রদান;

(খ) ফরম-ক পূরণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে তথ্য প্রদানকারীকে, প্রয়োজনে, সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) আদালতের চাহিদা বা নির্দেশ মোতাবেক সহায়তা প্রদান;

(ঙ) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বা এককভাবে পারিবারিক সহিংসতার মামলার অগ্রগতির তদারকিকরণ।

৫ **সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা**।- (১) আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আইনের অধীন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবার তালিকাভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয় বরাবরে ফরম-গ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, উহাকে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তালিকাভুক্ত করিয়া অথবা তালিকাভুক্ত না করিবার কারণ থাকিলে উহার কারণ

লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা বা না করার বিষয়টি অবহিত করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ না দিয়া উক্ত আবেদন প্রত্যাখান করা যাইবে।

(৩) মন্ত্রণালয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা বিভাগ বা জেলা ভিত্তিক প্রস্তুত করিয়া সকল প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে এবং সংবাদপত্র ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেও উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট প্রয়োগকারী কর্মকর্তা উক্ত তালিকা তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে বা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোন প্রকাশ্য স্থানে টানাইয়া রাখিবেন।

৬। **সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব**।- আইনের ধারা ৭ এর উপ ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত ধারার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে, যথাঃ

(ক) আইনের অধীন প্রদত্ত প্রতিকার ও সেবাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অবহিতকরণ;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যকণিকা প্রচারের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ।

(গ) ফরম-ক পূরণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সহযোগিতা প্রদান এবং ফরম-ঘ অনুযায়ী তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ এবং উহার অনুলিপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে সরবরাহকরণ;

(ঘ) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উহার কর্মপরিধিভুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিষয়টি নিকটবর্তী থানা এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ঙ) সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(চ) বিধি ৪ এর দফা (ঘ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে সার্বিক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান।

৭ **পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব**।- আইনের ধারা ৪ এর দফা (চ) এর উদ্দেশ্যপুরণকল্পে এবং উক্ত ধারার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া পুলিশ অফিসারের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকিবে, যথাঃ

(ক) পারিবারিক সহিংসতার সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর উহা ফরম অনুযায়ী (ঙ) লিপিবদ্ধকরণ এবং উহার অনুলিপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদানকারীকে সরবরাহকাণ এবং উক্ত ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(খ) পারিবারিক সহিংসতামূলক ঘটনাসংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র ও দ্রব্যাদিসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহণ

(গ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার তথ্য সংগ্রহে বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে সহযোগিতা প্রদান।

৮ **আদালত বরাবর আবেদন করিবার পদ্ধতি**। ধারা ১১ এর অধীন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে তথ্য প্রদানকারী, প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফরম-চ অনুযায়ী একজন আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

৯ **সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আবেদন**। প্রতিপক্ষ কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ বা উহার কোন শর্ত লংঘন করিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরাসরি সুরক্ষা আদেশ প্রদানকারী আদালতে অথবা প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করিবেন।

১০। **মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব**। মন্ত্রণালয় প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ফরম- ক

[বিধি ৩(১), ৪(১)(খ) ও ৬ (গ) দ্রষ্টব্য]

পারিবারিক সহিংসতার তথ্য বিবরণী

তথ্য/অভিযোগ দাখিলের তারিখঃ

১. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিবরণঃ

নাম ও বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পিতার/ স্বামীর নাম	মাতার নাম	স্থায়ী ঠিকানা	অংশীদারী বাসস্থান/ বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)	প্রতিপক্ষের সহিত সম্পর্ক	পরিবারের সদস্য সংখ্যা

বিঃ দ্রঃ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হইলে, তাহার ধরনঃ-

২. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে তথ্য প্রদানকারীর বিবরণ (যদি থাকে)ঃ

নাম ও বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পিতার/ স্বামীর নাম	মাতার নাম	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক

৩. প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত তথ্যঃ

নাম ও বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পিতার/ স্বামীর নাম	মাতার নাম	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক	মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)

৪. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সন্তান সম্পর্কিত তথ্য (যদি থাকে)ঃ

(ক) সন্তানের সংখ্যাঃ

(খ) সন্তানের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	লিঙ্গ	বর্তমানে কাহার তত্ত্বাবধানে আছে (নাম ও ঠিকানা)
১				
২				
৩				
৪				

৫. পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাঃ

তারিখ, সময় ও স্থান	সহিংসতার ধরনঃ শারীরিক/মানসিক/যৌন নির্যাতন বা আর্থিক ক্ষতি [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) দিন] এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজাদি	মন্তব্য

৬. অন্য কোন আইনে প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে কিনা?

মামলার ধরন ও ধারা	পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা	জিডি নম্বর, মামলা নম্বর, দায়েরের তারিখ, থানা ও আদালতের নাম	মামলাটির বর্তমান অবস্থা এবং পরবর্তী তারিখ

৭. কোন ধরনের সহযোগিতা বা সেবা প্রয়োজন ঃ

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। .....

৮. সংযুক্তির তালিকা (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)ঃ

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। .....

৫। .....

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/তথ্য প্রদানকারীর নামসহ
স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ ও তারিখ

স্বাক্ষী:

১। .....

২। .....

ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

ফরম-খ

[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

রেজিস্টার

কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানাঃ

ক্রমিক নম্বর	তথ্য প্রাপ্তির তারিখ ও সময়	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ তথ্য প্রদানকারীর নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	প্রতিপক্ষের নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	পারিবারিক সহিংসতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অন্য কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সম্পর্কিত তথ্য	আদালতে প্রেরণ সম্পর্কিত তথ্য (মামলার নম্বর, তারিখ এবং মামলার বর্তমান অবস্থা)	পদক্ষেপ গ্রহণের বিবরণ

প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর ঃ

ফরম-গ

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম

বরাবর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১. প্রতিষ্ঠানের নাম:
২. প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল :
৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও ঠিকানা (ফোন নম্বরসহ):
৪. নিবন্ধন নম্বর এবং যে আইনের অধীন নিবন্ধিত উক্ত আইনের নাম:
৫. টিআইএন নম্বর:
৬. প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ:
৭. যে সকল জেলায় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রহিয়াছে:
৮. প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিসের সংখ্যা:
৯. সেবা প্রদানের প্রকৃতি: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)
১০. সেবার বিস্তারিত বিবরণ ও ধরন:
১১. তালিকাভুক্ত হইতে ইচ্ছুক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত অন্য কোন তথ্য

আবেদনকারীর স্বাক্ষরঃ

তারিখ ঃ

সীল ঃ

** তথ্যের প্রমানস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।*

ফরম-ঘ

[বিধি ৬(গ) দ্রষ্টব্য]

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর	তথ্য প্রাপ্তির তারিখ ও সময়	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ তথ্য প্রদানকারীর নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	পারিবারিক সহিংসতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের তারিখ	করনীয় পদক্ষেপের বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম-ঙ

[বিধি ৭(ক) দ্রষ্টব্য]

থানায় সংরক্ষিত তথ্য রেজিস্টার

থানার নাম ও ঠিকানা ঃ

ক্রমিক নম্বর	থানায় আগমনের তারিখ ও সময়	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	পারিবারিক সহিংসতার তথ্য বিবরণী	প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের তারিখ	করনীয় পদক্ষেপের বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম-চ

[বিধি ৮ ও আইনের ধারা ১১ দ্রষ্টব্য]

আবেদন ফরম

বিজ্ঞ ..... আদালত

পারিবারিক সহিংসতা মোকদ্দমা নং: ...../২০১.....

নাম :

পিতা/স্বামী :

মাতা :

ঠিকানা :

..... আবেদনকারী / প্রার্থী

বনাম

নাম :

পিতা/স্বামী :

মাতা :

ঠিকানা :

..... প্রতিপক্ষ (গণ)

আবেদনকারী প্রার্থীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিসংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে তথ্য প্রদানকারী/প্রয়োগকারী কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর ১১ ধারা মোতাবেক পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য বিবরণী।

২. প্রার্থিত প্রতিকার (সহিংসতার ধরন অনুযায়ী):

৩. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৫, ১৬ বা ১৭ এর বিধান অনুযায়ী অন্য কোন প্রতিকারঃ

এমতাবস্থাধীনে প্রার্থনা এই যে, বিজ্ঞ আদালত দয়া পরবশ হইয়া এই আবেদনে বর্ণিত অবস্থা ও কারণাধীনে বর্ণিত বিষয়, পারিবারিক সহিংসতা তথ্য বিবরণী ও সংযুক্ত কাগজাদি বিবেচনা করিয়া, উক্ত আবেদনে দাবীকৃত প্রতিকার প্রদানের এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে পারিবারিক সহিংসতা হইতে সুরক্ষার আদেশ এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালতের মতে আইন ও ন্যায় মোতাবেক অন্য যে কোনো প্রতিকারের আদেশ প্রদানে মর্জি হয়।

স্থান: আবেদনকারী

তারিখ:

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক ও সত্য জানিয়া অদ্য .....খ্রিস্টাব্দ তারিখে আমার নিয়োজিত আইনজীবীর সেরেস্তায় নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

সত্যপাঠকারী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

SWAPNO

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities Project

Project Office:

Department of Public Health Engineering (DPHE) Bhaban

8th Floor, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

Website: www.swapno-bd.org